সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম
(Social Legislation and Social Work)

ইউনিট ৫

ভূমিকা

সামাজিক আইন সমাজের সকল প্রকার কুসংস্কার, কুপ্রথা ও ক্ষতিকর অবস্থা দূর করে একটি নিরাপদ ও কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠায় তৎপর। সমাজের উন্নয়ন, সমাজের মানুষের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য সামাজিক আইন কার্যকর ভূমিকা রাখে। সামাজিক আইন ব্যতীত সামাজিক নীতি প্রণয়ন সম্ভব নয়। সরকারকে জনকল্যাণকর নীতি গ্রহণ করতে হলে তা কেবল সামাজিক আইনের মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্য বলা হয় সামাজিক আইন সামাজিক নীতির প্রধান চালিকা হিসেবে কাজ করে। সাধারণত সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সামাজিক আইন প্রণীত হয়। পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে ক্ষতিকর অবস্থার মোকাবিলা, বঞ্চিত ও অবহেলিত শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠা, মৃত্যু, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, উপার্জনহীনতা মোকাবিলা, সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণে সামাজিক আইন অনবদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। অ-সামাজিক আইন হলো সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও বাস্তবায়নকৃত এমন সব জনকল্যাণমূলক ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যা পালন করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক এবং অমান্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ। সামাজিক স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রবর্তন করা হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–৫.১ : সামাজিক আইনের ধারণা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব
পাঠ-৫.২ : সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন
পাঠ-৫.৩ : মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
পাঠ-৫.৪ : শিশু আইন, ১৯৭৪
পাঠ-৫.৫ : যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
পাঠ-৫.৬ : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ১৯৮৩
পাঠ-৫.৭ : মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯
পাঠ-৫.৮ : নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০০৩
পাঠ-৫.৯ : হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২
পাঠ-৫.১০ : সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা

পাঠ-৫.১ সামাজিক আইনের ধারণা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব (Concept, Objectives and Imporatnce of Social Legislation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.১.১ সামাজিক আইন কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫.১.২ সামাজিক আইনের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫.১.৩ সামাজিক আইনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১.১ সামাজিক আইনের ধারণা (Concept of Social Legislation)

সামাজিক আইন বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত এমন সব বিধিবিধানকে বোঝায় যা সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণি বিশেষ করে শারীরিকভাবে অক্ষম, দরিদ্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং সমাজের বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করে সমাজকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে।

Dictionary of Social Welfare (১৯৪৮) এ বলা হয়েছে, "সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণের জন্য অথবা সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্রটিপূর্ণ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা কম থাকার কারণে সন্তোষজনক জীবনযাপনে অক্ষম, তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণে কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত আইন হলো সামাজিক আইন।"

D. Paul Chowdhury (১৯৭৯) তাঁর "*Social Administration*" গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক আইন সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ও বৈরি অবস্থানসমূহ প্রতিরোধ কল্পে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির সংস্কার সাধনে প্রয়োগ করা হয় (Social legislation tries to bring about reform in the working of social institutions and enables action to prevent social ill-health and preserve and promote social health.)।"

মোঃ আলী আকবরের মতে, "সামাজিক আইন সরকারের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য সামাজিক প্রগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে, যাতে সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ অথবা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব উপাদান বাধা সৃষ্টি করে তা দূর হয়।"

Robert L. Barker (১৯৯৫) তাঁর "*Dictionary of Social Work*" উল্লেখ করেন, "সামাজিক আইন হলো মানবকল্যাণের আবশ্যকীয় প্রয়োজনসমূহ, আয়-নিরাপত্তা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, নাগরিক অধিকার, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য গৃহীত কর্মসূচি পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত আইনসমূহ (Social legislation, laws and resource allocation providing for human welfare needs, income security, education and cultural progress, civil rights, consumer protection and programs that address social problems.)।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে সামাজিক আইন হলো, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত এমন সকল বিধিবিধান যা বিশেষ করে দুর্বল, অসহায় ও অবহেলিত গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানসহ সমাজজীবনের ক্ষতিকর অবস্থা নিরসন করে একটি সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

৫.১.২ সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য (Objectives of Social Legislation)

সমাজজীবনের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং সুস্থতা বর্ধন সামাজিক আইনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সমাজের যেসকল মানুষ পশ্চাৎপদ তাদেরকে উন্নয়নের গতিধারায় আনয়ন, সমস্যা মুক্তকরণ এবং সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করাই হলো সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য।

মোঃ আলী আকবর (১৯৬৫) তাঁর "*Elements of Social Welfare*" গ্রন্থে সামাজিক আইনের নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। যেমন– ক) সমাজ নিয়ন্ত্রণ; খ) সমাজসংস্কার ও পরিকল্পিত পরিবর্তন; গ) সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ঐক্যবদ্ধতা; ঘ) মূল্যবোধ ও জীবনমানের দ্বন্দ্ব নিরসন; ঙ) সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ; চ) সামাজিক সুবিচার ও সমতা; এবং ছ) সেবা সম্প্রসারণ ও সামঞ্জস্যবিধানের কর্মপন্থা গ্রহণ।

ডি. পল চৌধুরীর মতে, সামাজিক আইনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত অবস্থা নিরসন, জনকল্যাণ ও প্রগতি অর্জন এবং আইনের মাধ্যমে মানবাধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

সমাজজীবন থেকে অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ও কুপ্রথা নিরসনকল্পে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রণীত হয়েছে। বহু প্রাচীন প্রথা যেমন– দাসপ্রথা, সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতির প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণে সামাজিক আইন প্রণীত হয়েছে। আবার সামাজিক আইনের মাধ্যমে সমাজের নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, যুব, প্রবীণকল্যাণসহ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া সামাজিক আইনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অনাচার ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করা হয়।

সামাজিক আইন সমাজ থেকে সকল প্রকার অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত অবস্থা দূর করে সামাজিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে। সমাজের সকল সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধের মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে সামজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

এ প্রসঙ্গে এম. আব্দুল হালিম বলেন, অধিকতর কার্যকরভাবে সমাজকল্যাণমূলক আইন অসুবিধাগ্রস্থদের প্রতিরোধমূলক, সমাজসেবামূলক এবং জীবনমান সংরক্ষণে সামাজিক নীতিকে রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো উন্নত জীবন মান সৃষ্টি করা।

৫.১.৩ সামাজিক আইনের গুরুত্ব (Importance of Social Legislation)

সামাজিক আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত সমাজকাঠামো গঠন করে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ন্যায়সংগত অধিকার সংরক্ষণ এবং বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাঝে নিহিত। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা; সামাজিক অনাচার, কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণ; অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের অধিকার রক্ষা এবং ন্যায়বিচারের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে সামাজিক আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সামাজিক আইনের মাধ্যমে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, নারী, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা কোনো কারণে উপার্জন করতে অক্ষম নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ন্যায়সংগত অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

Encyclopedia of Social Work in India (vol.II, 1968) গ্রন্থে বলা হয়েছে- সামাজিক আইন মানবসমাজের ব্যাপক এলাকায় ব্যাপৃত যেমন– মানব সমাজের বহুমুখী চাহিদা নিরসনে বিভিন্ন আইন কাজ করে। এ আইনগুলোর অন্তর্ভুক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক যেমন– বিবাহ, পঙ্গু ব্যক্তি এবং সংখ্যালঘু বা ক্ষমতাহীন গোষ্ঠী; সামাজিক ব্যাধিকেন্দ্রিক কিছু সংস্কারমূলক ব্যবস্থা যেমন ভবঘুরে, কিশোর অপরাধ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং কিছু আইন রয়েছে যা সামাজিক নিরাপত্তাকেন্দ্রিক।

সামাজিক আইন সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়। সামাজিক আইন সামাজিক চাহিদাসমূহ পূরণ এবং সামাজিক সমস্যাবলী মোকাবিলার মাধ্যমে একটি উন্নত ও কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখে। এছাড়া সামাজিক নীতি প্রণয়ন, কার্যকর মানবকল্যাণ এবং সমাজকাঠামোর সম্পর্ক উন্নয়নে সামাজিক আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক আইন সমাজের অনাকাঙ্খিত অবস্থা দূর করে সমাজের বাঞ্ছিত পরিবর্তন বা সমাজ সংস্কার করে থাকে। সমাজে যেসকল ক্ষতিকর প্রথা বা অবস্থা থাকে তা দূর করে একটি কল্যাণমুখী ও সুস্থ সমাজ গঠন শুধু সামাজিক আইনের মাধ্যমেই সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক আইন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর করে সমাজের বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি কাঙ্খিত ও উন্নত সমাজ গঠনে সামাজিক আইনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক আইন বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত এমনসব বিধিবিধানকে বোঝায় যা সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণি বিশেষ করে শারীরিকভাবে অক্ষম, দরিদ্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণ করে, সমাজের বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করে সমাজকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে। অর্থ্যাৎ সামাজিক আইন হলো রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত এমন সকল বিধিবিধান যা বিশেষ করে দুর্বল, অসহায় ও অবহেলিত গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানসহ সমাজজীবনের ক্ষতিকর অবস্থা নিরসন করে একটি সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। পশ্চাৎপদ মানুষকে উন্নয়নের গতিধারায় আনয়ন এবং সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রণয়ন করা হয় কী?

ক) সামাজিক আইন খ) সামাজিক পরিকল্পনা

গ) সামাজিক নীতি ঘ) সামাজিক মূল্যবোধ

২। সামাজিক আইন হলো এমন সব বিধি বিধান যা–

i. অবহেলিত ও বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণ করে

ii. সমাজের বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার, কুপ্রথা দূর করে

iii. সমাজকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.২ সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন (Social problem and Social Legislation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.২.১ সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইনের মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.২.১ সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন (Social problem and Social Legislation)

মানুষ সমাজে কতগুলো স্থায়ী ব্যবস্থা বা সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের জৈবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে নিরাপদ জীবনযাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু কখনো কখনো এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যার ফলে সমাজের ব্যাপক অংশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, অনেক সময় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০৩:৬২০) তাঁর সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি গ্রন্থে বলেছেন, "সামাজিক সমস্যা বলতে এমন একটি পরিস্থিতি বা অবস্থাকে বোঝায় যা সমাজের মানুষের দৃষ্টিতে সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে অনুমিত হয়। আর তাই স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিকার একটা জরুরি কাজ বলে মনে করা হয়। সমাজের এই অনাকাঙ্খিত ও অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত উপায় হলো সামাজিক আইন।" সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় প্রণীত হয় সমাজিক আইন। সামাজিক সমস্যা মানুষের সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন করে তোলে। সমাজের মানুষ এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তোলে সামাজিক আন্দোলন। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনমত গঠন করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে সমস্যা দূরীকরণের জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তোলা হয়।

সচেতন এসকল জনগণ সমাজ থেকে সমস্যা দূরীকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকার বিষয়টির যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে এর সমাধানের জন্য সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু করে। অর্থাৎ একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করে থাকে। নিচের ছকে বিষয়টি যথার্থভাবে তুলে ধরা হলো:

চিত্র ৫.২.১ : সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন

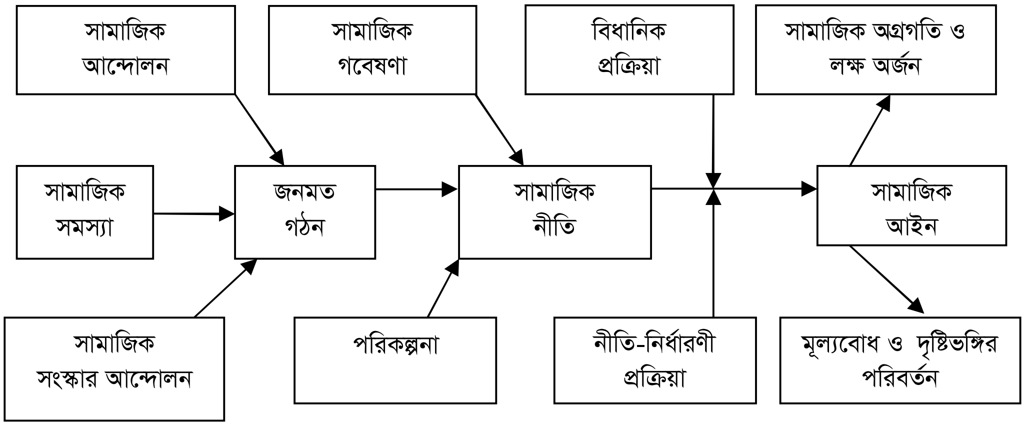

(উৎস: সরকার ও অন্যান্য ২০০১:২৫)

খসড়া আইনটি সংসদে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্র প্রধানের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আইনটি পাস হয়। প্রণীত আইনটি পরবর্তীতে তার লক্ষ্য অর্জনে অর্থাৎ সামাজিক বিপর্যস্ত অবস্থা দূর করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক আইন ও সামাজিক সমস্যা পরস্পর সম্পর্কিত। সামাজিক সমস্যা সমাজজীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। সমাজের মানুষের জীবনকে করে তোলে অশান্ত ও বিশৃঙ্খল। সামাজিক বিভিন্ন কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ে। আর এ অবস্থা থেকে সমাজকে উত্তরণের জন্য প্রণীত হয় সামাজিক আইন।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক সমস্যা বলতে এমন একটি পরিস্থিতি বা অবস্থা বোঝায় যা সমাজের মানুষের দৃষ্টিতে সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে অনুমিত হয়। আর তাই স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিকার একটা জরুরি কাজ বলে মনে করা হয়। সমাজের এই অনাকাঙ্খিত ও অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত উপায় হলো সামাজিক আইন। সামাজিক সমস্যা সমাজজীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। সমাজের মানুষের জীবনকে করে তোলে অশান্ত ও বিশৃঙ্খল। সামাজিক বিভিন্ন কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ে। আর এ অবস্থা থেকে সমাজকে উত্তরণের জন্য প্রণীত হয় সামাজিক আইন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সচেতন জনগণ সমাজ থেকে সমস্যা দূরীকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার দৃষ্টি আকর্ষণ করে?

ক) রাষ্ট্র খ) রাজনৈতিক দল
গ) সরকার ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান

২। সামাজিক আইন প্রণয়নে যেসকল প্রক্রিয়া অনুসরন করা হয় তা হলো–

i. সামাজিক আন্দোলন
ii. জনমত গঠন
iii. সামাজিক নীতি প্রণয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (Muslim Family Law Ordinance, 1961)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৩.১ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৩.১ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (Muslim Family Law Ordinance, 1961)

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে সমাজের বিভিন্ন বিধিবিধান মেনে চলতে হয়। সমাজের এ সকল বিধিবিধান সমাজের মানুষের রক্ষাকবচস্বরূপ। সময়ের প্রেক্ষাপটে সমাজের মানুষের স্বার্থে সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামাজিক আইন প্রণয়ন করেছেন। এমনই কিছু সামাজিক আইন হলো– মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১; শিশু আইন, ১৯৭৪; যৌতুক আইন, ১৯৮০; নারী নির্যাতন আইন, ১৯৮৩; মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯; নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০০৩; হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২; পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন; ২০১০ ইত্যাদি। পরবর্তী পাঠে উল্লিখিত আইনগুলো এবং আইনগুলোর বিভিন্ন ধারা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ আলোচনা করা হলো:

বর্তমান বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অধিকার সকল ক্ষেত্রে সমান। কিন্তু একসময় এ অবস্থা ছিল না। সকল ক্ষেত্রে নারীরা ছিল বঞ্চিত। বিশেষ করে বিবাহ, দেনমোহর, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। এজন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার (বর্তমান বাংলাদেশ) নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। ১৯৬১ সালের ১৫ জুলাই হতে এ অধ্যাদেশটি বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের জন্য কার্যকর হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিধানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **বিবাহের বয়স:** এ আইন অনুসারে বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলেদের বয়স ন্যূনতম ২১ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে।

২। **মেয়ের মতামতের প্রাধান্য:** এ অধ্যাদেশ-এ পাত্র পছন্দের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩। **বিবাহ রেজিস্ট্রেশন:** এ আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে হবে। এজন্য ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান করে এবং এ ব্যক্তি নিকাহ রেজিস্টার বলে গণ্য হন।

৪। **দ্বিতীয় বিবাহ:** এ আইন অনুসারে প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে না। তবে প্রথম স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, স্থায়ী শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে স্বামী ও স্ত্রীর মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সালিশি পরিষদের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে।

৫। **দেনমোহর:** এ আইন অনুসারে স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ বাধ্যতামূলক। স্বামী দেনমোহর প্রদানে ব্যর্থ হয়ে অভিযুক্ত হলে এক বছর কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৬। **তালাক:** এ আইনের বিধান মোতাবেক স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তাহলে তালাক ঘোষণার পর (মৌখিক অথবা লিখিত) যথাশীঘ্রই সালিশি পরিষদের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং এর এক কপি স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। এ বিধান ভঙ্গ করলে স্বামীকে সর্বাধিক এক বছর কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড ভোগ করতে হবে। নোটিশ প্রাপ্তির পর চেয়ারনম্যান সালিশি পরিষদের মাধ্যমে ৯০ দিনের মধ্যে উভয়ের মিলনের চেষ্টা করবেন এবং ৯০ দিন পর চেষ্টা ব্যর্থ হলো তালাক কার্যকর হবে। তবে তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলো গর্ভকাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না। এ আইন অনুযায়ী স্ত্রী চাইলেও স্বামীকে তালাক দিতে পারবে।

৭। **ভরণপোষণ:** এ আইন অনুযায়ী স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম হন বা একাধিক স্ত্রী রাখেন এবং তাদের সমানভাবে প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ লিখিতভাবে সালিশি পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট

অভিযোগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সালিশি পরিষদ স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নির্দেশ দিতে পারেন।

৮। **উত্তরাধিকার:** এ আইন অনুসারে কোনো পরিবারে দাদা জীবিত থাকা অবস্থা বাবা মারা গেলে দাদার সম্পত্তি থেকে নাতি-নাতনীদের বঞ্চিত করা যাবে না। তারা দাদার সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাওয়ার অধিকারী।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ নারীকল্যাণমূলক একটি সামাজিক আইন। নারীর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণের লক্ষ্যে এ আইনটি প্রণীত হয়। এ আইনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়া এ আইনের মাধ্যমে নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অধিকার সকল ক্ষেত্রে সমান। কিন্তু একসময় এ অবস্থা ছিল না। সকল ক্ষেত্রে নারীরা ছিল বঞ্চিত। বিশেষ করে বিবাহ, দেনমোহর, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। এজন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার (বর্তমান বাংলাদেশ) বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ জারি করে। ১৯৬১ সালের ১৫ জুলাই হতে এ আইনটি বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের জন্য কার্যকর হয়। এ আইনে বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়স নির্ধারণ, বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতের প্রাধান্যদান, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, দ্বিতীয় বিবাহ, দেনমোহর, ভরণপোষন, তালাক, সম্পত্তির উত্তরাধিকারসহ নানা বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের বয়স কত?

ক) ২১ ও ১৮ বছর খ) ২২ ও ২০ বছর
গ) ২৫ ও ২১ বছর ঘ) ২৬ ও ২২ বছর

২। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে যেসকল বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে তা হলো–

i. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ
ii. বহুবিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদকে নিরুৎসাহিত করা
iii. বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ শিশু আইন, ১৯৭৪ (The Children Act, 1974)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৪.১ শিশু আইন, ১৯৭৪ এর ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৪.১ শিশু আইন, ১৯৭৪ (The Children Act, 1974)

বাংলাদেশের শিশুদের মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ শিশুদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণীত হয়। ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালের ১ জুন বাংলাদেশের সর্বত্র এ আইটি কার্যকর হয়। আইনটিতে ১০টি ভাগে মোট ৭৮টি ধারা রয়েছে। এ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

ধারা: ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: এ আইন শিশু আইন, ১৯৭৪ নামে অভিহিত হবে।

ধারা ২। সংজ্ঞাসমূহ: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ আইনে–

ক. প্রাপ্ত বয়স্ক: এরূপ ব্যক্তি যিনি শিশু নন।

খ. শিশু: ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ে।

গ. অভিভাবক: এরূপ ব্যক্তি যিনি শিশু বা কিশোর অপরাধী সম্পর্কে গৃহীত কার্যধারা মেনে নিয়ে তার দায়িত্ব বা নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেন।

ধারা-৪। শিশু আদালতের এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতসমূহ: এ আইনে শিশু আদালতের ওপর অর্পিত ক্ষমতাসমূহ হাইকোর্ট বিভাগ, দায়রা আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজ ও সহকারী দায়রা জজের আদালত, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োগ করতে পারবেন।

ধারা-৯। শিশু আদালতে যারা উপস্থিত থাকতে পারবে: আদালতের সদস্যগণ ও কর্মকর্তা, মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষ, পুলিশ, শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবক এবং আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত ব্যক্তিগণ।

ধারা-১১। শিশুর হাজিরা মওকুফ: মামলার শুনানিতে আদালত শিশুর উপস্থিতি অনাবশ্যক মনে করলে তার হাজিরা মওকুফ করতে পারে।

ধারা-১৪। রোগাক্রান্ত শিশুকে অনুমোদিত স্থানে প্রেরণ: এ আইন অনুসারে বিচারাধীন কোনো শিশু যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়, সেক্ষেত্রে আদালত শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল বা অনুমোদিত যে কোনো স্থানে যতদিন আবশ্যক মনে করেন ততদিনের জন্য প্রেরণ করবেন।

ধারা-১৫। আদালতের আদেশ প্রদানে বিবেচ্য বিষয়সমূহ: এ আইনের অধীনে কোনো শিশুর মামলার আদেশ প্রদানের জন্য শিশুর চরিত্র ও বয়স, শিশুর জীবনধারণের পরিবেশ, শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করবেন।

ধারা-১৭। মামলায় জড়িত শিশুর পরিচয় প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা: বিচারাধীন কোনো শিশুর ছবি বা পরিচয় প্রকাশ করে এমন কোনো সংবাদ কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না। তবে আদালত যদি মনে করেন সংবাদ প্রকাশ শিশুর স্বার্থে কল্যাণকর, তখনই কেবল সংবাদ প্রকাশ করা যাবে।

ধারা-৩১। শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা নিয়োগ: সরকার প্রত্যেক জেলায় একজন শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারেন। তিনি শিশুর আচরণ সম্পর্কে আদালতে রিপোর্ট দেবেন, শিশুকে উপদেশ দেবেন, সহায়তা করবেন এমনকি প্রয়োজনবোধে শিশুর উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা-৩২ ও ৩৩। অবহেলিত শিশুদের তত্ত্বাবধান ও পালনের কর্মপন্থা: দুস্থ ও অবহেলিত শিশুর (যেমন– গৃহহীন, পিতৃমাতৃহীন, ভবঘুরে, নিষ্ঠুর আচরণের শিকার ইত্যাদি) তত্ত্বাবধান ও পালনের জন্য শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা বা কমপক্ষে সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদা সম্পন্ন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে

আদালত উক্ত শিশু/শিশুদের সর্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কিশোর হাজত, সংশোধনী কেন্দ্র বা আত্মীয়-স্বজনের বাসায় রাখতে পারেন।

ধারা-৩৪। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড: কারো হেফাজতে থাকা অবস্থায় যদি কোনো শিশুকে আক্রমণ, উৎপীড়ন, অবহেলোা, বর্জন ও অরক্ষিত অবস্থায় ত্যাগ করে যার ফলে শিশুটির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, তার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায় বা মানসিক বিকৃতি ঘটে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি দুই বছর মেয়াদের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা-৩৫। শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগের দণ্ড: কোনো ব্যক্তি যদি শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান বা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগদানে অজ্ঞতার ভান করেন, কিংবা উৎসাহ দেন অথবা শিশুকে আলামত হিসেবে ব্যবহার করেন, তবে উক্ত ব্যক্তি এক বছর মেয়াদি কারাদণ্ড বা তিনশত টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা-৩৭। শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী সুরা বা বিপজ্জনক ওষুধ প্রদানের দণ্ড: কোনো শিশুকে তার অসুস্থতা বা অন্য কোনো জরুরি কারণে যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কেউ যদি কোনো নেশাগ্রস্তকারী সুরা বা বিপজ্জনক ওষুধ প্রদান করেন তবে ওই ব্যক্তি এক বছর মেয়াদের কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা-৪১। শিশুকে পতিতালয়ে রাখার অনুমতিদানের দণ্ড: যদি কোনো ব্যক্তি চার বছর বা তদূর্ধ্ব কোনো শিশুকে পতিতালয়ে বাস করতে কিংবা প্রায়শ যাতায়াত করতে সুযোগ বা অনুমতি দেয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা-৪২। অসৎ পথে পরিচালনা করানোর দণ্ড: ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো মেয়ের হেফাজতকারী যদি তাকে বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করায় বা উৎসাহ দেয় অথবা স্বামী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার সাথে যৌনসঙ্গম করায় বা উৎসাহ দেয়, তবে ওই ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা-৪৪। শিশু কর্মচারীকে শোষণের দণ্ড: যদি কোনো শিশুকে কেউ ঘরের কাজে, কারখানায় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজের আড়ালে শিশুটিকে নিজ স্বার্থে শোষণ করে, আটকিয়ে রাখে বা তার উপার্জন ভোগ করে, তবে তিনি এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। একইভাবে যদি শিশুকে সমকাম, বেশ্যাবৃত্তি বা অন্যান্য নীতিগর্হিত কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য বা উৎসাহিত করে তবে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা- ৪৬। শিশু সম্পর্কিত রিপোর্ট বা ছবি প্রকাশের দণ্ড: বিচারাধীন শিশু সম্পর্কিত কোনো রিপোর্ট বা ছবি আদালতের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করলে দুই মাস মেয়াদের কারাদণ্ড বা দু'শ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

ধারা-৫১। শিশুর শাস্তি বিধানে বাধানিষেধ: কোনো শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কারাদণ্ড দেয়া যাবে না। তবে শিশুটির অপরাধ যতি এতই গুরুতর হয় যে কারাদণ্ড ছাড়া মামলাটি সুরাহা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে আদালত শিশুটিকে কারাদণ্ড প্রদান কিংবা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, সেরূপ স্থানে শর্তাধীনে আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারেন।

ধারা-৫২। শিশুকে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে সোপর্দ: কোনো শিশু মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত তার ক্ষেত্রে সমীচীন বিবেচনা করলে অন্যূন দুই বছর এবং অনধিক দশ বছর মেয়াদে আটক রাখার জন্য কোনো প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করতে পারেন।

শিশুকল্যাণমূলক আইনের ক্ষেত্রে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ আইন কার্যকর করার প্রেক্ষিতে ১৯২২ সালের বেঙ্গল শিশু আইন ও রিফরমেটরি স্কুল অ্যাক্ট রহিত করা হয়। এটি শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের সাথে ব্যবহার, চিকিৎসা ও কিশোর অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করার জন্য একটি আইন।

শিশু আইন মূলত বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদেরকে অপরাধের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপন বা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা জন্য এক অনবদ্য পদক্ষেপ। এ আইন শিশু শ্রেণিকে সকল অত্যাচার নিপীড়ন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ভবিষ্যতে যাতে তারা দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে তার জন্য সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে শিশুর প্রতি অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন, সরকারসহ সংশ্লিষ্ট মহলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। তাই বলা যায়, শিশু আইন, ১৯৭৪ এদেশের শিশুদের কল্যাণে একটি পূর্ণাঙ্গ পদক্ষেপ।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের শিশুদের মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ শিশুদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য শিশু আইন, ১৯৭৪ প্রণীত হয়। ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালের ১ জুন বাংলাদেশের সর্বত্র এ আইটি কার্যকর হয়। আইনটিতে ১০টি ভাগে মোট ৭৮টি ধারা রয়েছে। শিশুকল্যাণমূলক আইনের ক্ষেত্রে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ আইন কার্যকর করার প্রেক্ষিতে ১৯২২ সালের বেঙ্গল শিশু আইন ও রিফরমেটরি স্কুল অ্যাক্ট রহিত করা হয়। এটি শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের সাথে ব্যবহার, চিকিৎসা ও কিশোর অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করার একটি অনন্য আইন। শিশু আইন মূলত বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদেরকে অপরাধের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপন বা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা জন্য এক অনবদ্য পদক্ষেপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিশু আইন, ১৯৭৪ অনুযায়ী শিশু কারা?

ক) ১৫ বছরের কম বয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ে
খ) ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ে
গ) ১৭ বছরের কম বয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ে
ঘ) ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ে

২। শিশু আইন, ১৯৭৪-এ শিশুদের যেসকল অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে তা হলো:

i. মামলায় জড়িত শিশুর পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না
ii. কোনো শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কারাদণ্ড দেয়া যাবে না
iii. কোনো শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করা যাবে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ (Prohibition of Dowry Act, 1980)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৫.১ যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ এবং ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৫.১ যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ (Prohibition of Dowry Act, 1980):

মুসলিম পরিবারিক আইন, ১৯৬১ তে বহু বিবাহের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, অন্যদিকে, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের দেনমোহর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ফলে বাধ্যতামূলক দেনমোহর একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় পুরুষের জন্য। এরই প্রভাব হিসেবে যৌতুকের প্রচলন দেখা দেয়। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজের নারীকে হেয়প্রতিপন্ন করে এবং নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নারীকে যৌতুক নামক অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সমাজে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০। ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর থেকে সারা বাংলাদেশে আইনটি কার্যকর হয়। নিচে এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:** এ আইনটি যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ নামে অখ্যায়িত হবে। সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে আইনটি কার্যকর হবে।

২। **যৌতুকের সংজ্ঞা:** এ আইনে যৌতুক বলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত যে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বোঝায়; যা বিয়ে অনুষ্ঠানে একপক্ষ অন্য পক্ষকে প্রদান করে অথবা বিয়ের কোনো এক পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিয়ের যে কোনো পক্ষকে বিয়ের আসরে অথবা বিয়ের পূর্বে বা পরে, বিয়ের পণরূপে প্রদান করে বা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কতটাকা যৌতুক বলে বিবেচিত হবে তা উল্লেখ করতে হবে। তবে যৌতুক বলতে মুসলিম পরিবারিক আইন মোতাবেক ব্যবস্থিত দেনমোহর বা মোহরানা বোঝায় না।

৩। **যৌতুক প্রদান ও গ্রহণের শাস্তি:** এ আইন কার্যকর হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা প্রদান ও গ্রহণে সহায়তা করলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড যা এক বছরের কম হবে না বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৪। **যৌতুক দাবির শাস্তি:** এ আইন কার্যকর হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে অথবা বরের পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করলে পাঁচ বছর মেয়াদে কারাদণ্ড যা এক বছরের কম হবে না অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৫। **যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের চুক্তি বাতিল:** এ আইন বলবৎ হওয়ার পর যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের যে কোনো চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬। **অপরাধসমূহের আমল:** এ আইনের কোনো অপরাধ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের নিচের কোনো আদালত বিচার করতে পাবেন না। অপরাধ সংঘটনের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা না হলে আদালত এ আইনের কোনো অপরাধ আমলে নেবেন না। এছাড়াও এ আইন আমলযোগ্য অপরাধের জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে আইনানুযায়ী যেকোনো দণ্ড প্রদানে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বৈধ ক্ষমতার অধিকারী।

৭। **অপরাধসমূহ আমল-অযোগ্য, জামিন-অযোগ্য ও আপোষযোগ্য**

ক. **আমল-অযোগ্য অপরাধ:** যেসকল অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ব্যতীত আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না, সে সকল অপরাধ আমল-অযোগ্য। এ আইন অনুযায়ী একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করলে তবেই কোনো পুলিশ কর্মকর্তা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন।

খ. **জামিন-অযোগ্য অপরাধ:** এ আইনে কেউ অপরাধ করলে তা জামিন-অযোগ্য। তবে, জামিন মঞ্জুর করা বা না করা আদালতের বিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

গ. আপোষযোগ্য: যেসকল অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত। তবে ফরিয়াদি ও আসামি যদি তাদের বিবাদ মীমাংসা করে নেন তবে তা অনুমোদনযোগ্য।

এ আইনটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ আইন প্রণীত হওয়ার পর থেকে এদেশের নারীরা যৌতুক নামক অভিশাপ থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়েছে। যৌতুকের অভিশাপে অনেক দরিদ্র পরিবার তাদের কন্যাকে বিয়ে দিতে পারতো না এবং বিয়ে দেওয়ার পরও অত্যাচার, নির্যাতন ও তালাকের সম্মুখীন হতে হতো। এ আইন নারীদেরকে এ অবস্থা থেকে অনেকটা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবারিক আইনে বহু বিবাহের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, অন্যদিকে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের দেনমোহর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ফলে বাধ্যতামূলক দেনমোহর একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় পুরুষের জন্য। এরই প্রভাব হিসেবে যৌতুকের প্রচলন দেখা দেয়। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজের নারীকে হেয়প্রতিপন্ন করে এবং নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নারীকে যৌতুক নামক অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সমাজে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০। ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর থেকে সারা বাংলাদশে আইনটি কার্যকর হয়। এ আইনটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ আইন প্রণীত হওয়ার পর থেকে এদেশের নারীরা যৌতুক নামক অভিশাপ থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ সারা বাংলাদেশে কবে থেকে কার্যকরী হয়?

ক) ১৯৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর খ) ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর
গ) ১৯৮১ সালের ১ নভেম্বর ঘ) ১৯৮১ সালের ১ ডিসেম্বর

২। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০-এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ হলো–

i. আমল-অযোগ্য
ii. জামিন-অযোগ্য
iii. আপোষযোগ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৬ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (The Cruelty to Women [Deterent Punishment] Ordinance-1983)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৬.১: নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৬.১ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (The Cruelty to Women [Deterent Punishment] Ordinance-1983)

নারী নির্যাতন বাংলাদেশে নিত্য ঘটনা। নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন, অপহরণ, যৌতুকের কারণে হত্যা, ধর্ষণ, ধর্ষণের উদ্দেশ্যে হত্যা প্রভৃতি অপরাধ উল্লেখযোগ্য। সমাজে নারীকে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রণীত হয় নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩। এ আইনটি ১৯৮৩ সালের ৩ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে কার্যকর হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **শিরোনাম ও প্রয়োগ:** এ অধ্যাদেশ নারীদের প্রতি নৃশংস আচরণ বা নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮০ হিসেবে অভিহিত হবে। বাংলাদেশের সকল নাগরিক, তারা যেখানে থাকুক না কেন এবং বাংলাদেশে সাময়িকভাবে বসবাসরত যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য হবে।

২। **অন্যান্য সকল আইনের ওপর এর প্রাধান্য:** বর্তমানে প্রচলিত সকল আইনের ওপর এ আইনের বিধানসমূহ কার্যকর হবে।

৩। **বে-আইনি বা অসৎ উদ্দেশ্যে নারী অপহরণ বা অপহরণের শাস্তি:** যদি কোনো ব্যক্তি যে কোনো বয়সী নারীকে জোরপূর্বক অপহরণ করে পতিতাবৃত্তি বা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োগ বা ব্যবহার করে, নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করে অথবা অবৈধ যৌনসঙ্গমে বল প্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করো, তবে ঐ ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড (এক লাখ টাকা পর্যন্ত) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৪। **নারী ব্যবসা পরিচালনার শাস্তি:** যে কেউ যে কোনো বয়সের নারীকে যদি পতিতাবৃত্তি বা কোনো ব্যক্তির সাথে নিষিদ্ধ যৌনসঙ্গমের উদ্দেশ্যে বা কোনো বেআইনি ও অনৈতিক উদ্দেশ্যে আমদানি-রপ্তানি বা বিক্রি করে, ভাড়া দেয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করে বা ক্রয় করে বা অন্যদের কোনোভাবে দখলে নেয়, তবে ওই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড যা সাত বছরের কম হবে না বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৫। **যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি:** যদি কোনো নারীর স্বামী বা স্বামীর পিতামাতা বা অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজন যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটায় বা ঘটানোর চেষ্টা করে, তবে ওই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৬। **ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি:** যদি কেউ ধর্ষণ করতে গিয়ে বা ধর্ষণের চেষ্টা করে কোনো নারীর মৃত্যু ঘটায় অথবা ধর্ষণের পরে যদি নারীকে হত্যা করে তবে সে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন করাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৭। **ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত করার শাস্তি:** যদি কেউ ধর্ষণ করতে গিয়ে অথবা ধর্ষণের চেষ্টা করতে গিয়ে কোনো নারীর মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে বা গুরুতর আঘাত করে, তাহলে সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছর মেয়াদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৮। **অপরাধের সহায়তা ও প্ররোচনা:** যদি কেউ এ অধ্যাদেশের দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের সহায়তা করে বা প্ররোচনা দেয়, তাহলে অপরাধের জন্য যে শাস্তি, ওই ক্ষেত্রে সে একই শাস্তি ভোগ করবে।

নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ নারী সমাজের নিরাপত্তা বিধান, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার নির্যাতন থেকে নারীকে রক্ষার জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ আইনের মাধ্যমে নারীকে দিয়ে অবৈধ ও অনৈতিক ব্যবসা পরিচালনাসহ নারীকে যথেচ্ছা ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

নারী নির্যাতন বাংলাদেশে নিত্য ঘটনা। নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন, অপহরণ, যৌতুকের কারণে হত্যা, ধর্ষণ, ধর্ষণের উদ্দেশ্যে হত্যা প্রভৃতি অপরাধ উল্লেখযোগ্য। সমাজে নারীকে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রণীত হয় নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩। এ আইনটি ১৯৮৩ সালের ৩ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে কার্যকর হয়। ১৯৮৩ সালের এই আইন নারী সমাজের নিরাপত্তা বিধান, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার নির্যাতন থেকে নারীকে রক্ষার জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ আইনের মাধ্যমে নারীকে দিয়ে অবৈধ ও অনৈতিক ব্যবসা পরিচালনাসহ নারীকে যথেচ্ছা ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ অনুযায়ী ধর্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি কী?

ক) মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
খ) মৃত্যুদণ্ড বা ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
গ) মৃত্যুদণ্ড বা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
ঘ) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

২। নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ অনুযায়ী যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি কী?

ক) মৃত্যুদণ্ড বা ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
খ) মৃত্যুদণ্ড বা ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
গ) মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
ঘ) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

পাঠ-৫.৭ মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (Drug Control Ordinance, 1989)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৭.১ মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ এর ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৭.১: মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (Drug Control Ordinance, 1989)

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। মাদকের মরণছোবলে দেশের তরুণ ও যুবশক্তি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য ১৯৮৬ সালে গঠন করা হয় "মাদকদ্রব্যবিরোধী জাতীয় কমিটি"। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সালে মাদকদ্রব্যবিরোধী জাতীয় কমিটির প্রথম সভার মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত প্রচলিত আইনসমূহ সংস্কার ও নতুন আইন প্রণয়নের জন্য কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সালের ২০ জানুয়ারি "জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড" গঠিত হয় এবং মাদক নিয়ন্ত্রন অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ জারি করা হয়। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ বলবৎ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **মাদকদ্রব্য:** মত্ততাজনক বা নেশাগ্রস্ত দ্রব্য যা গ্রহণ বা সেবনে মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যেতে পারে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

'ক' শ্রেণির মাদকদ্রব্য: অপিয়াম, পপি, আফিম উদ্ভূত মাদকদ্রব্য যেমন– মরফিন, কোডিন, থিবাইন, নোজকাপাইন, নারকোটিন ইত্যাদি। আফিম সমধর্মী মাদকদ্রব্য যেমন– পেথিডিন, মেথাডন, আলফা প্রোডাইন, বেটাপ্রোডাইন ইত্যাদি। কোকেন বা কোকা উদ্ভূত যেকোনো পদার্থ, ক্যানাবিস, চরশ, হাশিশ, হেরোইন, মরফিন ইত্যাদি।

'খ' শ্রেণির মাদকদ্রব্য: গাঁজা, ভাং, তামাকদ্রব্য, অ্যালকোহলো, সকল প্রকার মদ, মিথাইল ইত্যাদি।

'গ' শ্রেণির মাদকদ্রব্য: তাড়ি, পঁচুই, স্পিরিট, অক্সাজিপাম, লোরাজিপাম, টেমাজিপাম ইত্যাদি।

২। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড:** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য "জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড" নামক ১৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি নীতিনির্ধারণী সংস্থা গঠন করা হয়। সরকার মনোনীত একজন সদস্য এ বোর্ডের চেয়ারম্যান। এছাড়া সরকারের এগারো জন মন্ত্রী ও একজন সচিব বোর্ডের অন্যতম সদস্য।

বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

ক. মাদকসৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ. মাদকদ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

গ. মাদকসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যেকোনো ধরনের গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা;

ঘ. মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঙ. মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

চ. মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন।

৩। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:** এ আইনের বিধানমতে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠা করা হয়। একজন মহাপরিচালক এ অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

৪। **মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার:** এ আইন অনুসারে–

ক. অ্যালকোহলো ব্যতীত সকল প্রকার মাদকদ্রব্য এবং মাদক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এমন সব উপকরণের চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত, পরিবহন, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

খ. শর্তসাপেক্ষে অ্যালকোহলো উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হবে। প্রধান প্রধান শর্তগুলো হলো:

১। এ আইনের অধীনে প্রদত্ত অনুমতি ব্যতীত অ্যালকোহলো উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন করা যাবে না;

২। কোনো ওষুধ তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার;

৩। অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি অ্যালকোহলো পান করতে পাবে না;

৪। কোনো বিদেশি নাগরিক প্রকাশ্যে নয়, লাইসেন্স প্রাপ্ত বার-এ বসে অ্যালকোহলো পান করতে পারবে; এবং

৫। চিকিৎসার প্রয়োজনে ও সিভিল সার্জন বা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপকের লিখিত ব্যবস্থাপত্র এবং সেই ব্যবস্থাপত্রের জন্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের লিখিত অনুমোদন ছাড়া কোনো মুসলমানকে অ্যালকোহলো গ্রহণের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৫। মাদকের দোকান বন্ধকরণ: কোনো এলাকার আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার যে কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান অনধিক ১৫ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে পাবেন। প্রয়োজনে বোর্ডের অনুমতিক্রমে এ মেয়াদ ত্রিশ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

৬। দেহ তল্লাশি: মাদকদ্রব্য বহনে সন্দেহভাজন ব্যক্তির সর্বোতভাবে দেহ তল্লশি করা যাবে।

৭। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র: প্রয়োজনে সরকার এক বা একাধিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

৮। মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা: কোনো মাদকাসক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা তার অভিভাবক মাদকাসক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা না নিলে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তার মনোনীত প্রতিনিধি মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠাতে নির্দেশ দিতে পারবেন।

৯। শাস্তির বিধান: এ আইনেরর বিধান লজ্ঞন করে মাদকদ্রব্য গ্রহণ, সরবরাহ, বহন, বিপণন, চাষাবাদ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি করলে মাদকদ্রব্যের শ্রেণি, প্রকৃতি, পরিমাণ, প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী সর্বনিম্ন দুই বছর থেকে যাবজ্জীবন, মৃত্যুদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে এ আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য তার মালিকানাধীন বা দখলীয় ঘরবাড়ি, জমি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারের অনুমতি দেন, তাহলে তিনি অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

এ আইনটিতে ১৯৩০ সালের "বিপজ্জনক ড্রাগস অ্যাক্ট"- এ যে সকল বিষয়ে অস্পষ্টতা ও জটিলতা ছিল তা দূর করা হয়েছে। আইনটি মূলত এদেশের তরুণ ও যুবসমাজকে মাদকের মরণছোবল থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের সবচেয়ে উল্লেযোগ্য বিষয় হলো মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। মাদকের মরণছোবলে দেশের তরুণ ও যুবশক্তি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য ১৯৮৬ সালে গঠন করা হয় মাদকদ্রব্যবিরোধী জাতীয় কমিটি। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সালে মাদকদ্রব্য বিরোধী জাতীয় কমিটির প্রথম সভার মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত প্রচলিত আইনসমূহ সংস্কার ও নতুন আইন প্রণয়নের জন্য কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সালের ২০ জানুয়ারি "জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড" গঠিত হয়। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ বলবৎ করা হয়। এ আইনটিতে ১৯৩০ সালের "বিপজ্জনক ড্রাগস অ্যাক্ট"- এ যে সকল বিষয়ে অস্পষ্টতা ও জটিলতা ছিল তা দূর করা হয়েছে। আইনটি মূলত এদেশের তরুণ ও যুবসমাজকে মাদকের মরণছোবল থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড-এর সদস্য সংখ্যা কতজন?

ক) ১৯ জন খ) ২১ জন

গ) ২৩ জন ঘ) ২৫ জন

২। মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী মাদকদ্রব্য হলো–

i. অপিয়াম পপি, মরফিন, নারকোটিন, পেথিডিন, হেরোইন, মরফিন

ii. গাঁজা, ভাং, তামাকদ্রব্য, অ্যালকোহলো, সকল প্রকার মদ, মিথাইল

iii. তাড়ি, পঁচুই, স্পিরিট, অক্সাজিপাম, লোরাজিপাম, টেমাজিপাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৮ নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০০৩ (Women and Children Repression Prevention Act, 2003)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৮.১ নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০০৩-এর ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৮.১ নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০০৩ (Women and Children Repression Prevention Act, 2003)

নারী ও শিশু নির্যাতন, নারীর প্রতি অব্যাহত বৈষম্য ও সহিংসতা রোধে ১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সালে পৃথক দুটি আইন প্রণয়ন হলেও তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া সময়ের পরিবর্তনে নারী ও শিশু নির্যাতনে যে নতুন রূপে প্রকাশ পায় তারই প্রেক্ষিতে প্রণীত হয় "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০"। কিন্তু আইনটির কিছু অস্পষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে আইনটির সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রণীত হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩। এ আইনে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০'-এর ১২টি অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়েছে এবং অপরাধের তদন্ত ও বিচার সম্পর্কিত ৬টি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **শিশু:** এ আইনে শিশু বলতে অনধিক ১৬ বছরের ছেলেমেয়েকে বুঝানো হয়েছে।

২। **যৌতুক:** এ আইনে যৌতুক বলতে, কোনো বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সঙ্গে জড়িত বরপক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের সময় বা তার পূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসেবে কনেপক্ষের কাছে দাবিকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ। অথবা, কোনো বিবাহে কনে কর্তৃক বিবাহের পর বরপক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তিকে উক্ত বিবাহের সময় বা তার পূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে বিবাহের পণ হিসেবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ।

৩। **দহনকারী পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি:** যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী বা ক্ষয়কারী পদার্থ দ্বারা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব একলক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এছাড়া শীরের অন্য কোনো অঙ্গহানি, বিকৃতি বা নষ্ট হলে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

৪। **নারী পাচার ও শাস্তি:** কোনো ব্যক্তি যদি বে-আইনি বা নীতিগর্হিত কাজে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীকে বিদেশে পাচার বা প্রেরণ অথবা ক্রয়বিক্রয়, ভাড়া বা নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর বা আটক রাখার জন্য অভিযুক্ত হয়, তবে ওই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৫। **শিশুর প্রতি অবিচার ও শাস্তি:** নারী ও শিশু ক্রয়বিক্রয়, আটক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অপহরণের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন বা অন্যূন ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। এছাড়া মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নারী বা শিশুকে আটক রাখার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

৭। **ধর্ষণের শাস্তি:** কোনো নারী বা পুরুষকে ধর্ষণ করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৮। **ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর ভরণপোষণ:** এ আইন অনুযায়ী ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকার বহন করবে। পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত ভরণপোষণের যাবতীয় খরচ ধর্ষকের নিকট থেকে সরকার আদায় করবে।

৯। **যৌন নিপীড়ন:** এ আইনে কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌনাকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করলে তা যৌন নিপীড়ন হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষত্রে অভিযুক্তের শাস্তি হবে ন্যূনতম ৩ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

১০। **সম্ভ্রমহানিজনিত কারণে আত্মহত্যা:** কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কোনো কাজের দ্বারা সম্ভ্রমহানি হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণে কোনো নারী আত্মহত্যা করলে বা উক্ত ব্যক্তি নারীকে প্ররোচিত করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ বছর, ন্যূনতম ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১১। **যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি:** কোনো নারীর স্বামী, পিতামাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তি যদি যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে, আহত করে তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১২। **তদন্তের সময়সীমা:** এ আইনের আওতায় সংঘটিত কোনো অপরাধ হাতেনাতে ধরা পড়লে অপরাধ সংঘটনের ১৫ দিনের মধ্যে বিচার কার্য শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের জন্য সর্বোচ্চ ১০৫ দিন ধার্য করা হয়েছে।

১৩। **রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার:** সংশোধিত বিধান অনুযায়ী বাদী বা বিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার বিচার রুদ্ধদ্বার কক্ষে পরিচালনার সুযোগ রাখা হয়েছে।

আইনটি নারী ও শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। পূর্বের আইনগুলোর তুলনায় আইনটি যথেষ্ট বাস্তবসম্মত। এ আইনে নারী ও শিশুর সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে অপরাধীদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

নারী ও শিশু নির্যাতন, নারীর প্রতি অব্যাহত বৈষম্য ও সহিংসতা রোধে ১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সালে পৃথক দুটি আইন প্রণয়ন হলেও তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া সময়ের পরিবর্তনে নারী ও শিশু নির্যাতনের যে নতুন রূপ প্রকাশ পায় তারই প্রেক্ষিতে প্রণীত হয় “নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০”। কিন্তু আইনটির কিছু অস্পষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে আইনটির সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রণীত হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩। এ আইনে ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০’-এর ১২টি অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়েছে এবং অপরাধের তদন্ত ও বিচার সম্পর্কিত ৬টি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। আইনটি নারী ও শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। পূর্বের আইনগুলোর তুলনায় আইনটি যথেষ্ট বাস্তবসম্মত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। এ আইনের আওতায় সংঘটিত কোনো অপরাধ হাতেনাতে ধরা পড়লে কতদিনের মধ্যে বিচার কার্য শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

ক) ১৫ দিন খ) ৩০ দিন
গ) ৪৫ দিন ঘ) ৬০ দিন

২। এ আইন অনুযায়ী বে-আইনি বা নীতিগর্হিত কাজে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীকে বিদেশে পাচারের শাস্তি–

i. মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
ii. যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদণ্ড
iii. মৃত্যুদণ্ড বা ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৯ হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২ (The Hindu Marriage Registration Act, 2012)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৯.১ হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২-এর ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৯.১ হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২ (The Hindu Marriage Registration Act, 2012)

বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার জন্য "হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২" প্রণীত হয়। ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রণীত আইনটিতে সর্বমোট ১৫টি ধারা রয়েছে। এ আইনের ধারাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

ধারা-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন: এ আইন হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হবে এবং নাগরিকত্ব নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসরত সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীর জন্য এটি প্রযোজ্য হবে। সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে এটি কার্যকর হবে।

ধারা-২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ আইনে–

ক) হিন্দু অর্থ বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনো নাগরিক;

খ) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক অর্থ ধারা-৪ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক;

গ) হিন্দু বিবাহ অর্থ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্পন্ন ও হিন্দু শাস্ত্র মোতাবেক প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী অনুমোদিত বিবাহ; এবং

ঘ) জেলা রেজিস্ট্রার অর্থ Registration Act, 1908 এর অধীন নিযুক্ত রেজিস্ট্রার বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা।

ধারা-৩। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন: অন্য কোনো আইন, প্রথা ও রীতিনীতিতে যাই থাকুক না কেন, হিন্দু বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু বিবাহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা যাবে। তবে কোনো হিন্দু বিবাহ এ আইনের অধীনে নিবন্ধিত না হলেও হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না।

ধারা-৪। বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ: এ আইনের অধীনে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্যে সরকার সিটি করপোরেশন এবং প্রতিটি উপজেলায় একজন করে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ প্রদান করবে যিনি এ আইনে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক হিসেবে অভিহিত হবেন।

ধারা-৫। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ: অন্য কোনো আইনে যাই থাকুক না কেন ২১ বছরের কম বয়স্ক কোনো হিন্দুপুরুষ ও ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোনো হিন্দু নারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে এ আইনের অধীনে তা নিবন্ধনযোগ্য হবে না।

ধারা-৬। বিবাহ নিবন্ধন পদ্ধতি: হিন্দু ধর্ম, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহের যে কোনো পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন করবেন। এ আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে হিন্দু ধর্ম, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী সম্পন্নকৃত বিবাহের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা যাবে।

ধারা-৭। বিবাহ নিবন্ধন ফিস: সরকার সময় সময় বিধি দ্বারা হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন ফিস এবং প্রতিলিপি সরবরাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ফিস নির্ধারণ করতে পারবে।

ধারা-৮। বিবাহ নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন: ধারা ৪ অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন সরকারি চাকুরি হিসেবে গণ্য হবেনা।

ধারা-৯। সবেতনে চাকরির ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ: কোনো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক তাকে যে এলাকার জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সে এলাকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথায়ও সবেতনে চাকরি করতে পারবেন না।

ধারা-১০। নিবন্ধন বহিসমূহ পরিদর্শন: কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বহি পরিদর্শন বা এর অন্তর্ভুক্ত কোনো বিবাহ নিবন্ধনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

ধারা-১১। নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ: প্রত্যেক হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক বছরের শুরুতে নিবন্ধন বহিতে নতুন ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক বিবাহ নিবন্ধন করবেন এবং নিবন্ধক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলে নিবন্ধন বহি ও অন্যান্য কাগজপত্র নিরাপত্তা হেফাজতের জন্য সংশ্লিষ্ট জেরা রেজিস্ট্রারের নিকট জমা প্রদান করবেন।

ধারা-১২। বিবাহ নিবন্ধনের প্রতিলিপি প্রদান: এ আইনের অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিবাহের পক্ষদ্বয় বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের প্রতিলিপি সরবরাহ করবেন।

ধারা-১৩। তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি: প্রত্যেক হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট জেলার রেজিস্ট্রারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৪। নিয়োগ স্থগিত বা বাতিলকরণ: সরকারের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক তার দায়িত্ব পালনে কোনো অসদাচরণের জন্য দায় অথবা দায়িত্ব পালনে অক্ষম তাহলে সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা তার নিয়োগ অনধিক দুই বছরের জন্য স্থগিত বা বাতিল করতে পারেন।

ধারা-১৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার যেকোনো বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার জন্য “হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২” প্রণীত হয়। ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রণীত আইনটিতে সর্বমোট ১৫টি ধারা রয়েছে। বাংলাদেশে এই প্রথম হিন্দু বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে বসবাসরত সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য এ আইন প্রযোজ্য হবে। এ আইন অনুযায়ী পুরুষের বয়স ২১ এবং মহিলোাদের বয়স ১৮ বছরের কম হলে বিবাহ নিবন্ধনযোগ্য হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২-এর বিধান অনুযায়ী ছেলেমেয়ের বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে কত বছর?

ক) ১৮ ও ১৫ বছর খ) ২১ ও ১৮ বছর
গ) ২৩ ও ২০ বছর ঘ) ২৫ ও ২৩ বছর

২। বাংলাদেশে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২ কবে প্রণীত হয়?

ক) ২৪ জুলাই, ২০১২ খ) ২৪ আগস্ট, ২০১২
গ) ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ঘ) ২৪ অক্টোবর, ২০১২

পাঠ-৫.১০ সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা (The Role of Social Worker in the Formulation and Implementation of Social Legislation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.১০.১ সামাজিক আইন প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১০.২ সামাজিক আইন প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১০.১ সামাজিক আইন প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা (The Role of Social Worker in the Formulation of Social Legislation)

সমাজকর্ম আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধানকারী প্রক্রিয়া। আধুনিক জীবনের নানাবিধা মনো-সামাজিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্ম মূলত পদ্ধতিনির্ভর একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। এর মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য প্রতিটি স্তরের জনগণকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। আধুনিক শিল্পসমাজে পেশাদার সমাজকর্মীরা সাধারণত সমাজকর্মের নীতি ও আদর্শ এবং কৌশল অনুসরণ করে এ কাজগুলো করে থাকেন।

সমাজের অনাকাঙ্খিত অবস্থা দূরীকরণ, অবহেলিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ, সর্বোপরি সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হয় সামাজিক আইন প্রণয়নের। সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক আইন প্রণয়নে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সামাজিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতগুলো প্রক্রিয়া বা ধাপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন– সমস্যা নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত করা, জনমত গঠন, সামাজিক আন্দোলন, আইনের খসড়া তৈরি, রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত গ্রহণ, সংসদে উপস্থাপন, সর্বশেষ রাষ্টপ্রধানের অনুমোদন। সামাজিক আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার এসব ধাপে সমাজকর্মীগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে কখনো নেতৃত্ব দিয়ে আবার কখনো সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সমাজকর্মীগণ সমাজকর্ম গবেষণার জ্ঞান ব্যবহার করে প্রথমে সমাজের সমস্যাগুলোর মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে তার প্রকৃতি ও ভয়বহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলেন। অতঃপর সমাজ থেকে এ সমস্যা দূর করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষকে এ সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাতে সক্ষম হন। যার ফলে কর্তৃপক্ষ অনেক সময় স্বউদ্যোগে আবার কখনো জনগণের চাপে আইন প্রণয়নে বাধ্য হন। এরপর দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত গ্রহণ করা হয়। এখানে সমাজকর্মী একজন সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের প্রেক্ষিতে সংসদে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে অধিকাংশের সমর্থনের প্রেক্ষিতে আইন পাস হয়। সর্বশেষ রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আইনটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় এবং আইনটিকে তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

এভাবে সমস্যা চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে সামাজিক আইন প্রণয়নের শেষ অবধি একজন সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন।

৫.১০.২: সামাজিক আইন প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা (The Role of Social Worker in the Implementation of Social Legislation)

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া যার রয়েছে বৈজ্ঞনিক ভিত্তি, নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার, দক্ষতা ও নিজস্ব মূল্যবোধ। সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করে কার্যকর জীবনযাপনে সক্ষম করে তুলতে প্রয়াসী হয়। অন্যদিকে সমাজকর্মীগণ সমাজকর্মের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত উপায়ে সেবাকর্ম পরিচালনা করে থাকেন।

সমাজকর্মীগণ সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য শুধু সামাজিক আইন প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব শেষ করেন না। প্রণীত আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয় সে ব্যাপারেও যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

প্রণীত সামাজিক আইন প্রয়োগের সবচেয়ে বড় বাধা হলো জনগণের সচেতনতার অভাব। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মী জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করতে বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন– সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে আইনটি সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে পারেন। অন্যদিকে, বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমেও আইনটি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে থাকেন।

আইন প্রয়োগে যেমন জনগণের সচেতনতার প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে উদ্বুদ্ধকরণ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী একজন সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রণীত সামাজিক আইন বাস্তবায়নে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ বা প্রথা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ সমাজের কল্যাণের পথে অনিষ্টকর ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রথা ও মূল্যবোধকে দূর করে গঠনমূলক ও উন্নয়নমুখী মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

সামাজিক সমস্যার সমাধান করে সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ বিরাজমান না থাকায় সামাজিক আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করে গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, সমাজে প্রচলিত আইনের কারণে সামাজিক আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পূর্বেকার আইন বা প্রণীত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া যার রয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার, দক্ষতা ও নিজস্ব মূল্যবোধ। সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করে কার্যকর জীবনযাপনে সক্ষম করে তুলতে প্রয়াসী হয়। আধুনিক জীবনের নানাবিধ মনো-সামাজিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়। সমাজের অনাকাঙ্খিত অবস্থা দূরীকরণ, অবহেলিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ, সর্বোপরি সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হয় সামাজিক আইন প্রণয়নের। সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক আইন প্রণয়নে ভূমিকা পালন করে থাকেন। সমাজকর্মীগণ সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য শুধু সামাজিক আইন প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব শেষ করেন না। প্রণীত আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যাতে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হয় সে ব্যাপারেও যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নিচের কোনটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া?

ক) সমাজবিজ্ঞান খ) নৃবিজ্ঞান
গ) সমাজকর্ম ঘ) অর্থনীতি

২। সমাজকর্মীগণ সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে যেসমস্ত ভূমিকা পালন করে–

i. সমাজে প্রচলিত সমস্যাগুলোর মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে
ii. সমস্যা দূর করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে
iii. আইন প্রয়োগে জনগণকে সচেতন করে তোলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সামাজিক আইন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
ক) Social Reform
খ) Social Problem
গ) Social Legislation
ঘ) Social Policy

২। কোন আইন অনুসারে প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে না?
ক) মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
খ) যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
গ) হিন্দু বিবাহ আইন, ২০১২
ঘ) পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

৩। ১৯৭৪ সালের শিশু আইন কয়টি ভাগে বিভক্ত?
ক) ৬ টি
খ) ৮ টি
গ) ১০ টি
ঘ) ১২ টি

৪। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হচ্ছে–
i. মৃত্যুদণ্ড
ii. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
iii. অর্থদণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৫। জসিম একজন সমাজকর্মী। সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে জসিম সমাজকর্মের যেসকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে–
i. নীতি
ii. কৌশল
iii. মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:
বাংলাদেশের শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে। আইনটি ১৯৭৬ সালে ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালে সারা বাংলাদেশে কার্যকর করা হয়।

৬। উদ্দীপকে কোন আইনের কথা বলা হয়েছে?
ক) রিফরমেটরী স্কুল এ্যাক্ট, ১৮৯৯
খ) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স এ্যাক্ট, ১৯৬০
গ) শিশু আইন, ১৯৭৪
ঘ) শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

৭। উক্ত আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো–
i. শিশুর বয়স নির্ধারণ
ii. অপরাধী শিশুদের বিচারের জন্য আলাদা আদালত স্থাপন
iii. গণমাধ্যমে অপরাধী শিশুদের পরিচয় প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৮। কোনো ব্যক্তি যৌতুক গ্রহণ বা প্রদান করলে অথবা সহায়তা করলে সর্বোচ্চ কত বছর কারাদণ্ড হবে?

ক) চার বছর খ) পাঁচ বছর

গ) ছয় বছর ঘ) সাত বছর

৯। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারি করা হয় যে কারণে−

i. মাদকের সরবরাহ ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে

ii. মাদকাসক্তদের শাস্তি দিতে

iii. মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন অনুযায়ী বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর বয়স কমপক্ষে কত বছর হওয়া উচিত?

ক) ছেলে ১৮ ও মেয়ে ১৫ বছর খ) ছেলে ২০ ও মেয়ে ১৮ বছর

গ) ছেলে ২১ ও মেয়ে ১৮ বছর ঘ) ছেলে ২৫ ও মেয়ে ২১ বছর

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় বাল্যবয়সে রফিকের বাবা মারা যায়। পরবর্তীতে রফিকের দাদার সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার সময় তার চাচারা তাকে দাদার সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করে। কারণ হিসেবে রফিকের চাচারা দাদা জীবিত থাকাকালীন তার বাবা মারা যাওয়ার কথা বলে। এ অবস্থায় রফিক কোনো দিশা না পেয়ে তার স্কুলের শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়। রফিকের স্কুলের শিক্ষক বলেন, ষাট এর দশকে প্রণীত একটি আইন দ্বারা মুসলমান সমাজের এ প্রথা রহিত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আইনটি মুসলিম সমাজের জন্য একটি মাইলফলকও।

ক) জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ) যৌতুক বলতে কী বোঝেন? ২

গ) উদ্দীপকে রফিকের স্কুল শিক্ষক কোন আইনের কথা বলেছেন? উত্তরাধিকার নির্ণয়ে উক্ত আইনের বিধান আলোচনা করুন। ৩

ঘ) "উক্ত আইনটি মুসলিম সমাজের জন্য মাইলফলকও"− উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। গ্রামের দরিদ্র কৃষক রহমত মিয়ার একমাত্র মেয়ে জুলেখার বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের সুরুজ মিয়ার ছেলে সবুজ মিয়ার সাথে। একমাত্র মেয়ে হওয়ায় রহমত মিয়া যথাসাধ্য ধুমধাম করে বিয়ের আয়োজন করে। বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই সবুজ মিয়া জুলেখার বাবর কাছে ৫০,০০০ টাকা দাবি করে। রহমত মিয়া টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সবুজ ও তার বাবা সুরুজ মিয়া দুজনে মিলে জুলেখার উপর শারীরিক অত্যাচার শুরু করে। জুলেখা নির্যাতন সইতে না পেরে অবশেষে সে তার স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার বিচারে বাপ ও ছেলে দুজনেরই শাস্তি হয়।

ক) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন প্রণয়ন করা হয় কবে? ১

খ) সামাজিক আইন বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে জুলেখার স্বামী ও শ্বশুরের শাস্তি হয়েছে কোন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যৌতুক প্রথা নিরোধের জন্য উক্ত আইনটি কী যথার্থ বলে আপনি মনে করেন? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে মতামত দিন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১	:	১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২	:	১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩	:	১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪	:	১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫	:	১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬	:	১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭	:	১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৮	:	১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৯	:	১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১০	:	১। খ ২। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৫	:	১। গ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। গ ৭। ঘ ৮। ক ৯। খ ১০। গ